মোগল দরবারে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

মোগল বাদশাহদের উদ্ভাবিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম অভিজাত শ্রেণির সংগঠন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার রূপায়ণ, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তব্য সম্পাদন, সামাজিক মান অব্যাহত রাখা, এমনকি সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্যন্ত বহুলাংশে নির্ভর করত অভিজাত শ্রেণির যথাযথ কর্তব্যপালনের ওপর। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও সংহতিবিধানে অভিজাতশ্রেণি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোগল অভিজাতশ্রেণির ওপর এমন সব আঘাত আসে যা তাদের মধ্যে তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্বই পরিশেষে মোগল সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও সংহতিবিধানে অভিজাতবর্গের ভূমিকা

Scanned with CamScanner

রমেশচন্দ্র মজুমদার—জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীবিন্যাস

রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো কিছু পুরানো ঐতিহাসিক মনে করেন, পরবর্তী মোগল বাদশাহদের দরবারে দল ও রাজনীতি অভিজাত সমাজের জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠী বিন্যাসের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল। মোগল অভিজাতদের তাঁরা প্রধানত দুটি দলে ভাগ করেছেন—হিন্দুস্থানি দল ও বিদেশি দল। প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল আফগান, ভারতীয় মুসলমান ও রাজপুতগণ। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন এই দলভুক্ত। বিদেশি দল দুটি উপদলে বিভক্ত ছিল—তুরানি ও ইরানি। তুরানি অভিজাতগণ তুরান অর্থাৎ মধ্য এশিয়া থেকে আগত, তাঁরা ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন সুন্নি। নিজাম-উল-মূল্‌ক, কামারউদ্দিন খান ও আবদুস সামাদের মতো অভিজাত এই উপদলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইরানিগণ এসেছিলেন ইরান অর্থাৎ পারস্য থেকে, ধর্মবিশ্বাসে তাঁরা ছিলেন শিয়া। এই উপদলে ছিলেন আসাদ খান ও তাঁর পুত্র জুলফিকার খান। এই ঐতিহাসিকগণ মনে করেন হিন্দুস্থানি দল স্থানীয় শক্তিবর্গ যেমন, রাজপুত, মারাঠা, জাঠ প্রভৃতির সঙ্গে বন্ধুত্বের পক্ষপাতী ছিল। অপরদিকে দুটি বিদেশি উপদল হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ে ব্যাপকতর ভিত্তিতে অভিজাত সম্প্রদায় গঠনের বিরোধী ছিল।

হিন্দুস্থানি ও বিদেশি দল

বিদেশি দল—তুরানি ও ইরানি

সতীশ চন্দ্রের অভিমত

সতীশ চন্দ্রের মতো অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঐতিহাসিক মোগল দরবারের উপরোক্ত গোষ্ঠী বিভাজনকে সঠিক বলে মনে করেন না। তাঁর মতে আওরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষদিকে দরবারে যে গোষ্ঠীগুলি গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তি ছিল কৌম ও পারিবারিক সম্পর্ক অথবা ব্যক্তিগত স্বার্থ। যেমন ইরানি বংশোদ্ভূত জুলফিকার খানের সমর্থক ছিলেন আবদুস সামাদের মতো এক নেতৃস্থানীয় তুরানি ওমরাহ, দাউদ খান পন্নির মতো এক আফগান ওমরাহ এবং রাও রামসিংহ হাড়া ও দলপৎ বুন্দেলার মতো হিন্দু নেতা। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়, যাঁরা ভারতীয় শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্বের পক্ষপাতী ছিলেন, প্রয়োজনবোধে নিজাম-উল-মূল্‌ক, মহম্মদ আমিন খান ও আবদুস সামাদের মতো প্রথম সারির তুরানি অভিজাতবর্গের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন। ফারুখশিয়ারের সিংহাসনচ্যুতির পর নিজাম-উল-মূল্‌ক যখন ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি জাতি ও ধর্মের জিগির তোলেন এই বলে যে সৈয়দদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইরানি ও তুরানি নির্বিশেষে সব মুসলমানের মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম। কারণ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ও তাদের হিন্দু সমর্থকদের দ্বারা মোগল রাজবংশ ও ইসলাম বিপন্ন। রাজপুত নেতা জয় সিংহ ছিলেন কট্টর সৈয়দবিরোধী। রক্ষণশীল মুসলমান নিজাম-উল-মূল্‌ক ১৭২৪ খ্রি.-এ ও তারপরে রাজনৈতিক স্বার্থে মারাঠাদের সঙ্গেও মৈত্রী স্থাপন করেন। অতএব সতীশ চন্দ্র মনে করেন মোগল দরবারে গোষ্ঠীগুলির সৃষ্টির পেছনে জাতি ও ধর্মের ভূমিকা ছিল গৌণ। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনো কোনো অভিজাত কখনো কখনো জাতি ও ধর্মের জিগির তুলতেন।

গোষ্ঠীগুলির ভিত্তি ছিল কৌম, পারিবারিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ

গোষ্ঠী নির্বিশেষে অভিজাতদের মধ্যে স্বার্থভিত্তিক সম্পর্ক ছিল

স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাতি ও ধর্মের জিগির তোলা হত

আওরঙ্গজেব ও তাঁর পরবর্তী সময়ে দুটি গোষ্ঠী

আওরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষদিকে মোগল দরবারে দুটি গোষ্ঠী ছিল পুরোভাগে। পরবর্তী চার দশকে এই গোষ্ঠী দুটিই দরবারি রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রথম দলের নেতৃত্বে ছিলেন ওয়াজির আসাদ খান ও তাঁর পুত্র মীর বক্সী জুলফিকার খান। তাঁরা যথাক্রমে সাত হাজার ও ছয় হাজার মনসবের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের প্রধান সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন দাউদ খান পন্নি, দলপৎ বুন্দেলা ও রাও রাম সিংহ হাড়ার মতো খ্যাতনামা সেনানায়ক। দরবারে এই গোষ্ঠীর মিলিত মনসবের সংখ্যা ছিল ২৪,৫০০ জাট ও ২৪০০০ সওয়ার। দরবারে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন গাজিউদ্দিন ফিরুজ জঙ। তাঁর পুত্রদ্বয় চিনকিলিচ খান (পরবর্তীকালে নিজাম-উল-মূল্‌ক নামে পরিচিত হন) ও হামিদ খান বাহাদুর এবং তাঁদের সম্পর্কীয় ভাই মহম্মদ আমিন খান। এই গোষ্ঠীর

প্রথম গোষ্ঠী—আসাদ খান ও জুলফিকার খান

দ্বিতীয় গোষ্ঠী—গাজিউদ্দিন ফিরুজ জঙ, চিনকিলিচ খান

Scanned with CamScanner

মুখ্য সমর্থকদের মিলিত মনসবের সংখ্যা ছিল ২০০০০ জাট ও ১৫৬০০ সওয়ার। এরা প্রথম গোষ্ঠীর চেয়ে শক্তি ও প্রভাবে নিকৃষ্ট হলেও অনেক বেশি সুসংবদ্ধ ছিল। প্রকৃতিতে এই গোষ্ঠী ছিল জাতি ও পরিবারভিত্তিক। সমর্থকদের অধিকাংশই ছিল তুরান থেকে আগত। এই দুটি প্রধান গোষ্ঠী ছাড়া মোগল দরবারে ১৭১৩ থেকে ১৭২১ খ্রি. পর্যন্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব ছিল। তাঁরা রাজপুত ও মারাঠা অভিজাতদের উচ্চতর পর্যায়ের অভিজাতগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিজাম-উল-মুল্‌ক ও মহম্মদ আমিন খানের গোষ্ঠী এই নীতিকে আওরঙ্গজেব অনুসৃত নীতির বর্জন, রাষ্ট্রের ইসলামীয় প্রকৃতির পরিপন্থী, মোগল সাম্রাজ্য ও রাজবংশের স্বার্থবিরোধী বলে গণ্য করতেন। সৈয়দদের নীতির দ্বারাই মোগলদের সৃষ্ট রাজনৈতিক কাঠামোর সংহতিবিধান সম্ভব ছিল। কিন্তু অন্য কোনো গোষ্ঠী এই ব্যবস্থায় আগ্রহী ছিল না। এইভাবে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন অভিজাত গোষ্ঠীর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বাদশাহের অনুগ্রহ লাভের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। অভিজাতর্গের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতালাভের প্রচেষ্টা মোগল দরবারে প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এই দ্বন্দ্ব সমকালীন ঘটনাপ্রবাহকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করে।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রভাব, ১৭১৩-২১

ভারতীয় অভিজাতবর্গের সঙ্গে মৈত্রী

অভিজাতবর্গের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সমকালীন ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবিত করে

দরবারে এই গোষ্ঠীগুলির উদ্ভবের পটভূমি প্রস্তুত হয়েছে দীর্ঘ সময় ধরে। *প্রথমত,* রাজপুত, মারাঠা, জাঠ প্রভৃতি জাতির বিরুদ্ধবাদী আন্দোলন দমনে আওরঙ্গজেবের ব্যর্থতা ও তার ফলে মোগল রাজবংশের মর্যাদা হ্রাস। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সংঘটিত গৃহযুদ্ধের ফলে মোগল রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে, বিশেষ করে এই যুদ্ধগুলিতে কোনো বাদশাহেরই স্থায়ী জয়লাভ সূচিত হয়নি। *দ্বিতীয়ত,* জাগীর ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান সংকটের ফলে জাগীর বিতরণে অযথা বিলম্ব হতে থাকে। জাগীর বণ্টিত হওয়ার পরও কখনো কখনো অনুমিত ও প্রকৃত আয়ের (জমা ও হাসিল) মধ্যে প্রচুর ব্যবধান থেকে যেত। গোষ্ঠী গঠনের অন্যতম কারণ ছিল উৎকৃষ্ট ও সহজে পরিচালনযোগ্য জাগীরের জন্য কাড়াকাড়ি। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী গোষ্ঠীই উৎকৃষ্ট জাগীরের সিংহভাগ লাভ করত। *তৃতীয়ত,* প্রতিটি গোষ্ঠীই কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তাদের সমর্থকদের নিয়ে গঠিত হত। এরা ওয়াজির ও মীর বক্সীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি করায়ত্ত করে রাষ্ট্রব্যবস্থার পুরোভাগে আসার চেষ্টা করত। *চতুর্থত,* সব গোষ্ঠীই বাদশাহের ওপর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট থাকত। প্রতিদ্বন্দ্বী অভিজাতদের সঙ্গে বাদশাহের যোগাযোগের স্বাধীনতা খর্ব করে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ সংবলিত পদগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইত।

গোষ্ঠীগুলির উদ্ভবের পটভূমি

উত্তরাধিকার যুদ্ধের পর কোনো বাদশাহই স্থায়িত্ব লাভ করেননি

জাগীরদারি সংকট

সব গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি দখল করে বাদশাহকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করত

সতীশ চন্দ্র মনে করেন, 'উজীরত' অর্থাৎ ওয়াজিরের পদ লাভের জন্য সংগ্রাম শুধু বাদশাহ ও অভিজাতবর্গের মধ্যে সংগ্রাম ছিল না। কারণ অভিজাতরা ছিল বহুধা বিভক্ত, তাদের কোনো অভিন্ন স্বার্থ ও যোগসূত্র ছিল না। তিমুরীয় শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করে কোনো অভিজাত গোষ্ঠীর পক্ষে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল না। আবার উজীরতের জন্য সংগ্রাম শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী অভিজাতগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চপদ ও ক্ষমতা দখলের লড়াই ছিল না। জুলফিকার খান ও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় শুধু নিজেদের জন্য ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেননি। কিন্তু তাদের আধিপত্য অন্যান্য অভিজাতবর্গের মধ্যে ঈর্ষার সঞ্চার করেছিল বলে তাঁরা তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই সংকটের সমাধান করা যেত যদি ওয়াজিরগণ বাদশাহের আস্থাভাজন হতেন। ওয়াজিরগণ যেহেতু সামরিক শক্তির জোরে ওই পদ দখল করতেন সেইজন্য বাদশাহ তাঁদের আনুগত্য সম্পর্কে সন্দিহান থাকতেন। উজীরতের প্রতি বাদশাহের এই মনোভাবের দরুন সমগ্র দরবার ও অভিজাত সমাজ পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ফারুখশিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁদের বশংবদ কাউকে সিংহাসনে স্থাপন করলে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের পতন ঘটায়।

উজীরতের জন্য সংগ্রাম

ওয়াজিরগণ বাদশাহের আস্থাভাজন ছিলেন না

ফারুখশিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য সৈয়দদের বিরুদ্ধে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়

Scanned with CamScanner

উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাতদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা

নিজাম-উল-মুল্‌ক দাক্ষিণাত্যে

সাদাত খান অযোধ্যায়

বাদশাহের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে ওয়াজিরগণ দরবারে এক শক্তিশালী সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টা করত। উদ্দেশ্য ছিল বাদশাহ ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিশ্চল করা। কিন্তু কোনো অভিজাতগোষ্ঠীই এত শক্তিশালী ছিল না যে বাকি সকলকে দাবিয়ে রাখতে বা নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে পারত। সাম্রাজ্য শাসনের উপযুক্ত বাদশাহ ও তাঁর সাহায্যপুষ্ট সুদক্ষ ওয়াজির কোনোটিই যদি না থাকে তাহলে অপর এক বিপদের সম্ভাবনা ছিল। সে ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনো অভিজাত স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হত। এই পরিস্থিতিতেই নিজাম-উল-মুল্‌ক দাক্ষিণাত্যে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাদাত খান অযোধ্যায় পৃথক রাজ্য গঠন করেন। এঁরা বাদশাহের প্রতি নামমাত্র আনুগত্য প্রদর্শন করে বিশাল ভূখণ্ডের অধিশ্বর হয়ে ওঠেন।

অভিজাতবর্গের রাজনৈতিক সংকট

জাঠ, সৎনামী, রাজপুত ও মারাঠাদের বিদ্রোহ

মোগল সাম্রাজ্যের মর্যাদা হ্রাস

সাম্রাজ্যের প্রতি অভিজাতবর্গের আস্থার অভাব

বস্তুত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোগল অভিজাতবর্গকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। তার সাংগঠনিক কাঠামোটি ক্রমশ ভেঙে পড়ে। প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সংকট হল ১৬৬৯ খ্রি.-এর জাঠ বিদ্রোহ। তারপর একে একে আসে সৎনামী ও রাজপুতদের একাংশের বিদ্রোহ। সবচেয়ে গুরুতর সংকট ছিল মারাঠাদের উত্থান। সবকটি বিদ্রোহই মোগল সাম্রাজ্যের সামরিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। বাদশাহের প্রতি অভিজাতবর্গের আনুগত্য নির্ভর করত তাঁর সামরিক সাফল্যের ওপর। বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতা ও মারাঠাদের সঙ্গে দীর্ঘ অসফল যুদ্ধ অভিজাতবর্গের মনোবল ভেঙে দেয়। তারা ধরেই নেয় মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে চলেছে। ফলে মোগল সাম্রাজ্যের চাকরিতে তারা নিরাপদ বোধ করত না। মানুচির বর্ণনা থেকে জানা যায়, মোগল অভিজাতবর্গের কর্তব্যবোধ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছয় যে আওরঙ্গজেব ব্যক্তিগতভাবে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত না থাকলে তাঁর সেনাপতিগণ রাজ আজ্ঞা যথাযথভাবে পালন করত না।

জাগীরদারি সংকট

'জমা' ও 'হাসিল'-এর পার্থক্য

উৎকৃষ্ট জাগীর নিয়ে দ্বন্দ্ব

ওয়াজির ও মীর বক্সীর ওপর সব গোষ্ঠীই প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট

আলোচ্য সময়ে মোগল অভিজাতবর্গকে এক দুরূহ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। তা হল জাগীরদারি সংকট। একদিকে যেমন জাগীরের 'জমা' ও 'হাসিল'-এর পার্থক্য বৃদ্ধি পেতে থাকে অপরদিকে মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমিত সংখ্যক উৎকৃষ্ট জাগীরের জন্য শুরু হয় মনসবদারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা। জাগীরের অভাব মোগল অভিজাতবর্গের ভেতরকার সুপ্ত বিভাজক শক্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলে ও তারা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মধ্যেই উৎকৃষ্ট জাগীরগুলি বণ্টিত হত বলে সবগোষ্ঠীই চাইত ওয়াজির ও মীর বক্সীর মতো পদাধিকারীদের ওপর নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে শাসনযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। শাসনকার্য পরিচালনার সব দায়দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে অভিজাতবর্গ নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থকেই বড়ো করে দেখে। ফলে সাম্রাজ্যের সংহতিকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আরভিনের মন্তব্য

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলাফল

এইভাবে প্রধান অভিজাতবর্গ যারা ক্ষয়িষ্ণু মোগল সাম্রাজ্যকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করতে পারত, তারাই এর ধ্বংসের অন্যতম নিমিত্ত হয়ে দাড়ায়। উইলিয়ম আরভিন বলেছেন, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল বাদশাহগণ ছিলেন পুতুলের মতো নিষ্প্রাণ। মোগল অভিজাতগণ দক্ষ বাজিকরের মতো এই প্রাণহীন বাদশাহকে নিয়ে পুতুল খেলা শুরু করে। সমকালীন অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগল দরবারে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এক অভূতপূর্ব শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এর ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়, আঞ্চলিক শক্তির উত্থান ঘটে ও বৈদেশিক আক্রমণের পথ প্রশস্ত হয়।

Scanned with CamScanner